শান্তিনিকেতন

(ষষ্ঠ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম

বোলপুর

মূল্য ।• আনা

সূচী

শান্তিনিকেতন

তিনতলা

আমাদের তিনটে অবস্থা দেখ্‌তে পাই। তিনটে বড় বড় স্তরে মানবজীবন গড়ে তুলছে, একটা প্রাকৃতিক, একটা ধর্ম্মনৈতিক, একটা আধ্যাত্মিক।

প্রথম অবস্থায় প্রকৃতিই আমাদের সব। তখন আমরা বাইরেই থাকি। তখন প্রকৃতিই আমাদের সমস্ত উপলব্ধির ক্ষেত্রই হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাইরের দিকেই আমাদের সমুদয় প্রবৃত্তি, সমুদয় চিন্তা, সমুদয় প্রয়াস। এমন কি, আমাদের মনের মধ্যে যা গড়ে ওঠে তাকেও আমরা বাইরে স্থাপন না করে থাকৃতে পারি না—আমাদের মনের জিনিষগুলিও

আমাদের কল্পনায় বাহ্যরূপ গ্রহণ করতে থাকে। আমরা সত্য তাকেই বলি যাকে দেখ্‌তে ছুঁতে পাওয়া যায়। এইজন্য আমাদের দেবতাকেও আমরা কোনো বাহ্য পদার্থের মধ্যে বদ্ধ করে,' অথবা তাঁকে কোনো বাহ্যরূপ দান করে' আমরা তাঁকে প্রাকৃতিক বিষয়েরই সামিল করে দিই। বাহিরের এই দেবতাকে আমরা বাহ্য প্রক্রিয়াদ্বারা শান্ত করবার চেষ্টা করি। তাঁর সম্মুখে বলি দিই, খাদ্য দিই, তাঁকে কাপড় পরাই। তখন দেবতার অনুশাসন-গুলিও বাহ্য অনুশাসন। কোন্ নদীতে স্নান করলে পুণ্য, কোন্ খাদ্য আহার করলে পাপ, কোন্ দিকে মাথা রেখে শুতে হবে, কোন্ মন্ত্র কি রকম নিয়মে কোন্ তিথিতে কোন্ দণ্ডে উচ্চারণ করা আবশ্যক, এই সমস্তই তখন ধর্ম্মানুষ্ঠান।

এমনি করে দৃষ্টি ঘ্রাণ স্পর্শাদি দ্বারা মনের দ্বারা কল্পনার দ্বারা ভয়ের দ্বারা

ভক্তির দ্বারা বাহিরকে নানারকম করে নেড়েচেড়ে তাকে নানা রকমে আঘাত করে এবং তার দ্বারা আঘাত খেয়ে আমরা বাহিরের পরিচয়ের সীমায় এসে ঠেকি। তখন বাহিরকেই আর পূর্ব্বের মত একমাত্র বলে মনে হয় না—তখন তাকেই আমাদের একমাত্র গতি, এক মাত্র আশ্রয়, একমাত্র সম্পদ্ বলে আর জানিনে। সে আমাদের সম্পূর্ণ আশাকে জাগিয়ে তুলে একদিন আমাদের সমস্ত মনকে টেনে নিয়েছিল বলেই যখন আমরা তার সীমা দেখ্‌তে পেলুম তখন তার উপরে আমাদের একান্ত অশ্রদ্ধা জন্মাল—তখন প্রকৃতিকে মায়াবিনী বলে গাল দিতে লাগ্‌লুম, সংসারকে একেবারে সর্ব্বতো-ভাবে অস্বীকার করবার জন্যে মনে বিদ্রোহ জন্মাল। তখন বল্‌তে লাগ্‌লুম, যার মধ্যে কেবলি আধিব্যাধি মৃত্যু, কেবলই ঘানির বলদের চলার মত অনন্ত প্রদক্ষিণ তাকেই

আমরা সত্য বলে তারই কাছে আমরা সমস্ত আত্মসমর্পণ করেছিলুম, আমাদের এই মূঢ়তাকে ধিক্।

তখন বাহিরকে নিঃশেষে নিরস্ত করে দিয়ে আমরা অন্তরেই বাসা বাঁধবার চেষ্টা করলুম। যে বাহিরকে একদিন রাজা বলে মেনেছিলুম তাকে কঠোর যুদ্ধে পরাস্ত করে দিয়ে ভিতরকেই জয়ী বলে প্রচার করলুম। যে প্রবৃত্তিগুলি এত দিন বাহিরের পেয়াদা হয়ে আমাদের সর্ব্বদাই বাহিরের তাগিদেই ঘুরিয়ে মেরেছিল তাদের জেলে দিয়ে শূলে চড়িয়ে ফাঁসি দিয়ে একেবারে নির্ম্মূল করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। যে সমস্ত কষ্ট ও অভাবের ভয় দেখিয়ে বাহির আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছিল সেই সকল কষ্ট ও অভাবকে আমরা একেবারে তুচ্ছ করে দিলুম। রাজস্থয় যজ্ঞ করে উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে বাহিরের সমস্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রাজাকে হার

মানিয়ে জয়পতাকা আমাদের অন্তর রাজধানীর উচ্চ প্রাসাদ চূড়ায় উড়িয়ে দিলুম। বাসনার পায়ে শিকল পরিয়ে দিলুম। সুখ দুঃখকে কড়া পাহারায় রাখ্‌লুম, পূর্ব্বতন রাজত্বকে আগাগোড়া বিপর্য্যস্ত করে তবে ছাড়লুম।

এমনি করে বাহিরের একান্ত প্রভুত্বকে খর্ব্ব করে যখন আমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠালাভ করলুম তখন অন্তরতম গুহার মধ্যে একি দেখি? এ ত জয়গর্ব্ব নয়। এ ত কেবল আত্মশাসনের অতি বিস্তারিত সুব্যবস্থা নয়। বাহিরের বন্ধনের স্থানে এ ত কেবল অন্তরের নিয়ম বন্ধন নয়। শান্তদান্ত সমাহিত নির্ম্মল চিদাকাশে এমন আনন্দ জ্যোতি দেখলুম যা অন্তর এবং বাহির উভয়কেই উদ্ভাসিত করেছে—অন্তরের নিগূঢ় কেন্দ্র থেকে নিখিল বিশ্বের অভিমুখে যার মঙ্গলরশ্মিরাজি বিচ্ছুরিত হচ্চে।

তখন ভিতর বাহিরের সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর হয়ে

গেল। তখন জয় নয় তখন আনন্দ—তখন সংগ্রাম নয় তখন লীলা—তখন ভেদ নয় তখন মিলন, তখন আমি নয় তখন সব,—তখন বাহিরও নয়, ভিতরও নয়, তখন ব্রহ্ম—তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ। তখন আত্মা পরমাত্মার পরম মিলনে বিশ্বজগৎ সম্মিলিত। তখন স্বার্থবিহীন করুণা, ঔদ্ধত্যবিহীন ক্ষমা অহঙ্কারবিহীন প্রেম—তখন জ্ঞানভক্তিকর্ম্মে বিচ্ছেদবিহীন পরিপূর্ণতা।

১০ই ফাল্গুন ১৩১৫

বাসনা, ইচ্ছা, মঙ্গল

* আমাদের সমস্ত কর্ম্ম চেষ্টাকে উদ্বোধিত করে তোলবার ভার সব প্রথমে বাহিরের উপরেই ন্যস্ত থাকে। সে আমাদের নানা দিক দিয়ে নানা প্রকারে সজাগ চঞ্চল করে তোলে।

সে আমাদের জাগাবে অভিভূত করবে না এই ছিল কথা। জাগ্‌ব এইজন্যে যে, নিজের চৈতন্যময় কর্তৃত্বকে অনুভব করব—দাসত্বের বোঝা বহন করব বলে নয়।

রাজার ছেলেকে মাষ্টারের হাতে দেওয়া হয়েছে। মাষ্টার তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তার মূঢ়তা জড়তা দূর করে' তাকে রাজত্বের পূর্ণ অধিকারের যোগ্য করে দেবে এই ছিল তার সঙ্গে বোঝাপড়া—রাজা যে কারো দাস নয় এই শিক্ষাই হচ্চে তার সকল শিক্ষার শেষ।

কিন্তু মাষ্টার অনেক সময় তার ছাত্রকে এমনি নানাপ্রকারে অভিভূত করে ফেলে, মাষ্টারের প্রতিই একান্ত নির্ভর করার মুগ্ধ সংস্কারে এমনি জড়িত করে, যে বড় হয়ে সে নামমাত্র সিংহাসনে বসে, সেই মাষ্টারই রাজার উপর রাজত্ব করতে থাকে।

তেমনি বাহিরও যখন শিক্ষাদানের চেয়ে বেশি দূরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সে আমাদের চেপে পড়বার জো করে তখন তাকে একেবারে বরখাস্ত করে দিয়ে তার জাল কাটাবার পন্থাই হচ্চে শ্রেয়ের পন্থা।

বাহির যে শক্তি দ্বারা আমাদের চেষ্টাকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাকে আমরা বলি বাসনা। এই বাসনায় আমাদের বাইরের বিচিত্র বিষয়ের অনুগত করে। যখন যেটা সামনে এসে দাঁড়ায় তখন সেইটেই আমাদের মনকে কাড়ে—এমনি করে আমাদের মন নানার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায়। নানার

সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের এই হচ্চে সহজ উপায়।

এই বাসনা যদি ঠিক জায়গায় না থামে—এই বাসনার প্রবলতাই যদি জীবনের মধ্যে সব চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তাহলে আমাদের জীবন তামসিক অবস্থাকে ছাড়াতে পারে না, আমরা নিজের কর্তৃত্বকে অনুভব ও সপ্রমাণ করতে পারি না,—বাহিরই কর্ত্তা হয়ে থাকে; কোনোপ্রকার ঐশ্বর্য্যলাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। উপস্থিত অভাব, উপস্থিত আকর্ষণই আমাদের এক ক্ষুদ্রতা থেকে আর এক ক্ষুদ্রতায় ঘুরিয়ে মারে। এমন অবস্থায় কোনো স্থায়ী জিনিষকে মানুষ গড়ে তুলতে পারে না।

এই বাসনা কোন্ জায়গায় গিয়ে থামে? ইচ্ছায়। বাসনার লক্ষ্য যেমন বাইরের বিষয়ে, ইচ্ছার লক্ষ্য তেমনি ভিতরের অভিপ্রায়ে। উদ্দেশ্য জিনিষটা অন্তরের জিনিষ। ইচ্ছা

আমাদের বাসনাকে বাইরের পথে পথে যেমন-তেমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে দেয় না— সমস্ত চঞ্চল বাসনাকে সে একটা কোনো আন্তরিক উদ্দেশ্যের চারদিকে বেঁধে ফেলে।

তখন কি হয়? না, যে সকল বাসনা নানা প্রভুর আহ্বানে বাইরে ফিরত, তারা এক প্রভুর শাসনে ভিতরে স্থির হয়ে বসে। অনেক থেকে একের দিকে আসে।

টাকা করতে হবে এই উদ্দেশ্য যদি মনের ভিতরে রাখি তাহলে আমাদের বাসনাকে যেমন-তেমন করে ঘুরে বেড়াতে দিলে চলে না। অনেক লোভ সম্বরণ করতে হয়, অনেক আরামের আকর্ষণকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, কোনো বাহ্য বিষয় যাতে আমাদের বাসনাকে এই উদ্দেশ্যের আনুগত্য থেকে ভুলিয়ে না নিতে পারে সে জন্যে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকতে হয়। কিন্তু বাসনাই যদি আমাদের ইচ্ছার চেয়ে প্রবল হয় সে যদি উদ্দেশ্যকে না মানতে

চায়—তাহলেই বাহিরের কর্তৃত্ব বড় হয়ে ভিতরের কর্তৃত্বকে খাটো করে দেয় এবং উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যায়। তখন মানুষের সৃষ্টিকার্য্য চলে না। বাসনা যখন তার ভিতরের কুল পরিত্যাগ করে তখন সে সমস্ত ছারখার করে দেয়।

যেখানে ইচ্ছা শক্তি বলিষ্ঠ—কর্তৃত্ব যেখানে অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত, সেখানে তামসিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে মানুষ রাজসিকতার উৎকর্ষ লাভ করে। সেইখানে বিদ্যায় ঐশ্বর্য্যে প্রতাপে মানুষ ক্রমশই বিস্তার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু বাসনার বিষয় যেমন বহির্জগতে বিচিত্র—তেমনি ইচ্ছার বিষয়ও ত অন্তর্জগতে একটি আধটি নয়। কত অভিপ্রায় মনে জাগে তার ঠিক নেই। বিদ্যার অভিপ্রায়, ধনের অভিপ্রায়, খ্যাতির অভিপ্রায় প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠ্‌তে চায়। সেই ইচ্ছার অরাজক বিক্ষিপ্ততাও বাসনার বিক্ষিপ্ততার চেয়ে ত কম নয়।

তা ছাড়া আর একটা জিনিষ দেখ্‌তে পাই। যখন বাসনার অনুগামী হয়ে বাহিরের সহস্র রাজাকে প্রভু করেছিলুম তখন যে বেতন মিল্‌ত তাতে ত পেট ভরত না। সেই জন্যেই মানুষ বারম্বার আক্ষেপ করে বলেছে বাসনার চাকরি বড় দুঃখের চাকরি। এ'তে যে খাদ্য পাই তাতে ক্ষুধা কেবল বাড়িয়ে তোলে এবং সহস্রের টানে ঘুরিয়ে মেরে কোনো জায়গায় শান্তি পেতে দেয় না।

আবার ইচ্ছার অনুগত হয়ে ভিতরের এক একটি অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যখন ঘুরে বেড়াই তখনো ত অনেক সময়ে মেকি টাকায় বেতন মেলে। শ্রান্তি আসে, অবসাদ আসে, দ্বিধা আসে। কেবলি উত্তেজনার মদিরার প্রয়োজন হয়—শান্তিরও অভাব ঘটে। বাসনা যেমন বাহিরের ধন্দায় ঘোরায়, ইচ্ছা তেমনি ভিতরের ধন্দায় ঘুরিয়ে মারে, এবং শেষকালে মজুরি দেবার বেলায় ফাঁকি দিয়ে সারে।

এই জন্য, বাসনাগুলোকে ইচ্ছার শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ করা যেমন মানুষের ভিতরকার কামনা—সে রকম না করতে পারলে সে যেমন কোনো সফলতা দেখ্‌তে পায়না তেমনি ইচ্ছাগুলিকেও কোনো এক প্রভুর অনুগত করা তার মূলগত প্রার্থনার বিষয়। এ না হলে সে বাঁচে না। বাহিরের শত্রুকে জয় করবার জন্যে ভিতরের যে সৈন্যদল সে জড় করলে নায়কের অভাবে সেই দুর্দ্দান্ত সৈন্যগুলার হাতেই সে মারা পড়বার জো হয়। সৈন্যনায়ক রাজ্য দস্যুবিজিত রাজ্যের চেয়ে ভাল বটে কিন্তু সেও সুখের রাজ্য নয়। তামসিকতায় প্রবৃত্তির প্রাধান্য, রাজসিকতায় শক্তির প্রাধান্য—এখানে সৈন্যের রাজত্ব।

কিন্তু রাজার রাজত্ব চাই। সেই সরাজকতার পরম কল্যাণ কখন্ উপভোগ করি? যখন বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সঙ্গত করি।

সেই ইচ্ছাই জগতের এক ইচ্ছা—মঙ্গল ইচ্ছা। সে কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছা নয়—সে নিখিলের মূলগত নিত্যকালের ইচ্ছা। সেই সকলের প্রভু সেই এক প্রভুর মহারাজ্যে যখন আমার ইচ্ছায় সৈন্যদলকে দাঁড় করাই তখনি তারা ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়। তখন ত্যাগে ক্ষতি হয় না, ক্ষমায় বীর্য্যহানি হয় না, সেবায় দাসত্ব হয় না। তখন বিপদ ভয় দেখায় না, শাস্তি দণ্ড দিতে পারে না, মৃত্যু বিভীষিকা পরিহার করে। একদিন সকলে আমাকে পেয়েছিল—অবশেষে রাজাকে যখন পেলুম—তখন আমি সকলকে পেলুম। যে বিশ্ব থেকে নিজের অন্তরের দুর্গে আত্মরক্ষার জন্যে প্রবেশ করেছিলুম—সেই বিশ্বেই আবার নির্ভয়ে বাহির হলুম—রাজার ভৃত্যকে সেখানে সকলে সমাদর করে গ্রহণ করলে।

১১ই ফাল্গুন

স্বাভাবিকী ক্রিয়া

যে এক ইচ্ছা বিশ্বজগতের মূলে বিরাজ করচে তারই সম্বন্ধে উপনিষৎ বলেছেন— "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" সেই একেরই জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়া স্বাভাবিকী। তাহা সহজ, তা স্বাধীন, তার উপরে বাইরের কোনো কৃত্রিম তাড়না নেই।

আমাদের ইচ্ছা যখন সেই মূল মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গত হয় তখন তারও সমস্ত ক্রিয়া স্বাভাবিকী হয়। অর্থাৎ তার সমস্ত কাজকে কোনো প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না—অহঙ্কার তাকে ঠেলা দেয় না, লোক সমাজের অনুকরণ তাকে সৃষ্টি করে না, লোকের খ্যাতিই তাকে কোনোরকমে জীবিত করে রাখে না, সাম্প্রদায়িক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি জোগায় না, নিন্দা তাকে

আঘাত করে না, উৎপীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈন্য তাকে নিরস্ত করে না।

মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে যাঁদের ইচ্ছা সম্মিলিত হয়েছে তাঁরা যে বিশ্বজগতের সেই অমর শক্তি সেই স্বাভাবিকী ক্রিয়া শক্তিকে লাভ করেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। বুদ্ধদেব কপিলবস্তুর সুখসমৃদ্ধি পরিহার করে যখন বিশ্বের মঙ্গল প্রচার কর্ম্মে বেরিয়েছিলেন তখন কোথায় তাঁর রাজকোষ, কোথায় তাঁর সৈন্যসামন্ত! তখন বাহ্য উপকরণে তিনি তাঁর পৈতৃক রাজ্যের দীনতম অক্ষমতম প্রজার সঙ্গে সমান। কিন্তু তিনি যে বিশ্বের মঙ্গল ইচ্ছার সঙ্গে তাঁর ইচ্ছাকে যোজিত করেছিলেন সেই জন্য তাঁর ইচ্ছা সেই পরাশক্তির স্বাভাবিকী ক্রিয়াকে লাভ করেছিল। সেই জন্যে কত শত শতাব্দী হল তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর মঙ্গল ইচ্ছার স্বাভাবিকী ক্রিয়া আজও

চল্‌চে। আজও বুদ্ধগয়ায় নিভৃত মন্দিরে গিয়ে দেখি সুদূর জাপানের সমুদ্রতীর থেকে সংসার-তাপতাপিত জেলে এসে অন্ধকার অর্দ্ধরাত্রে বোধিদ্রুমের সম্মুখে বসে সেই বিশ্ব-কল্যাণী ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে জোড়হাতে বল্‌চে বুদ্ধস্য শরণং গচ্ছামি। আজও তাঁর জীবন মানুষকে জীবন দিচ্চে, তাঁর বাণী মানুষকে অভয় দান করচে—তাঁর সেই বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ইচ্ছার ক্রিয়ার আজও ক্ষয় হল না।

যিশু কোন্ অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে কোন্ এক পশুরক্ষণশালায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন —কোনো পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোনো রাজার প্রাসাদে নয়, কোনো মহৈশ্বর্য্যশালী রাজ-ধানীতে নয়, কোনো মহাপুণ্যক্ষেত্র তীর্থস্থানে নয়। যারা মাছ ধরে জীবিকা অর্জ্জন করত এমন কয়েকজন মাত্র য়িহুদি যুবক তাঁর শিষ্য হয়েছিল—যেদিন তাঁকে রোমরাজের প্রতিনিধি

অনায়াসেই ক্রুশে বিদ্ধ করবার আদেশ দিলেন সেই দিনটি জগতের ইতিহাসে যে চিরদিন ধন্য হবে এমন কোনো লক্ষণ সেদিন কোথাও প্রকাশ পায়নি। তাঁর শত্রুরা মনে করলে সমস্তই চুকে বুকে গেল—এই অতি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটিকে একেবারে দলন করে নিবিয়ে দেওয়া গেল। কিন্তু কার সাধ্য নেবায়! ভগবান যিশু তাঁর ইচ্ছাকে তাঁর পিতার ইচ্ছার সঙ্গে যে মিলিয়ে দিয়েছিলেন—সেই ইচ্ছার মৃত্যু নেই, তার স্বাভাবিকী ক্রিয়ার ক্ষয় নেই। অত্যন্ত কৃশ এবং দীনভাবে যা নিজেকে প্রকাশ করেছিল তাই আজ দুই সহস্র বৎসর ধরে বিশ্বজয় করচে।

অখ্যাত অজ্ঞাত দৈন্যদারিদ্র্যের মধ্যেই সেই পরম মঙ্গলশক্তি যে আপনার স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াকে প্রকাশ করেছেন ইতিহাসে বারম্বার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। হে অবিশ্বাসী, হে ভীরু, হে দুর্ব্বল, সেই শক্তিকে

আশ্রয় কর, সেই ক্রিয়াকে লাভ কর—নিজেকে শক্তিহীন বলে বাইরের দিকে ভিক্ষা-পাত্র তুলে ধরে বৃথা আক্ষেপে কাল হরণ কোরো না—তোমার সামান্য যা সম্বল আছে তা রাজার ঐশ্বর্য্যকে লজ্জা দেবে।

১১ই ফাল্গুন

পরশরতন

"তাঁর নাম পরশরতন
পাপি-হৃদয় তাপ হরণ—
প্রসাদ তাঁর শান্তিরূপ ভকতহৃদয়ে জাগে।"

সেই পরশরতনটি প্রাতঃকালের এই উপাসনায় কি আমরা লাভ করি? যদি তার একটি কণামাত্রও লাভ করি তবে কেবল মনের মধ্যে একটি ভাবরসের উপলব্ধির মধ্যেই তাকে আবদ্ধ করে যেন না রাখি। তাকে স্পর্শ করাতে হবে—তার স্পর্শে আমার সমস্ত দিনটিকে সোনা করে তুলতে হবে।

দিনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সেই পরশরতনটি দিয়ে আমার মুখের কথাকে স্পর্শ করাতে হবে, আমার মনের চিন্তাকে স্পর্শ করাতে হবে—আমার সংসারের কর্ম্মকে স্পর্শ করতে হবে।

তাহলে, যা হাল্কা ছিল একমুহূর্তে তাতে গৌরব সঞ্চার হবে, যা মলিন ছিল তা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যার কোনো দাম ছিল না তার মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

আমাদের সকাল বেলাকার এই উপাসনাটিকে ছোঁয়াব, সমস্তদিন সব-তাতে ছোঁয়াব—তাঁর নামকে ছোঁয়াব, তাঁর ধ্যানকে ছোঁয়াব, "শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্" এই মন্ত্রটিকে ছোঁয়াব, উপাসনাকে কেবল হৃদয়ের ধন করবনা—তাকে চরিত্রের সম্বল করব, তার দ্বারা কেবল স্নিগ্ধতালাভ করবনা—প্রতিষ্ঠালাভ করব।

লোকে প্রচলিত আছে প্রভাতের মেঘ ব্যর্থ হয়—তাতে বৃষ্টি দেয় না। আমাদের এই প্রভাতের উপাসনা যেন তেমনি ক্ষণকালের জন্যে আবির্ভূত হয়ে সকালবেলাকার হাওয়া-তেই উড়ে চলে না যায়।

কেননা, যখন রৌদ্র প্রখর তখনি স্নিগ্ধতার

দরকার, যখন তৃষ্ণা প্রবল তখনি বর্ষণ কাজে লাগে। সংসারের ঘোরতর কাজের মাঝখানেই শুষ্কতা আসে, দাহ জন্মায়। ভিড় যখন খুব জমেছে, কোলাহল যখন খুব জেগেছে তখনি আপনাকে হারিয়ে ফেলি;—আমাদের প্রভাতের সঞ্চয়কে সেই সময়েই যদি কোনো-কাজে লাগাতে না পারি—সে যদি দেবত্র সম্পত্তির মত মন্দিরেরই পূজার্চ্চনার কাজে নিযুক্ত থাকে, সংসারের প্রয়োজনে তাকে খাটাবার জো থাকেনা—তাহলে কোনো কাজ হল না।

দিনের মধ্যে এক একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন—যে সময়ে, হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি, নয়ত আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে, সেই শুষ্কতা ও জড়ত্বের আবেশ

কালে তুচ্ছতার আক্রমণকে আমরা যেন প্রশ্রয় না দিই—আত্মার মহিমাকে তখনো যেন প্রত্যক্ষগোচর করে রাখি। যেন তখনি মনে পড়ে আমরা দাঁড়িয়ে আছি "ভূর্ভুবস্বর্লোকে," মনে পড়ে যে, অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ এই মুহূর্তে আমাদের অন্তরে চৈতন্য বিকীর্ণ করচেন, মনে পড়ে যে, সেই শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং এই মুহূর্তে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন। সমস্ত হাস্যালাপ, সমস্ত কাজকর্ম্ম, সমস্ত চাঞ্চল্যের অন্তরতম মূলে যেন একটি অবিচলিত পরিপূর্ণতার উপলব্ধি কখনো না সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

তাই বলে একথা যেন কেউ না মনে করেন যে, সংসারের সমস্ত হাসিগল্প সমস্ত আমোদ-আহ্লাদকে একেবারে বিসর্জ্জন দেওয়াই সাধনা। যার সঙ্গে আমাদের যেটুকু স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাকে রক্ষা না করলেই সে আমাদের অস্বাভাবিক রকম করে' পেয়ে

বসে—ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরো বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে। স্বভাবত যে জিনিষটা বাইরের ক্ষণিক জিনিষ, ত্যাগের চেষ্টায় অনেক সময় সেইটাই আমাদের অন্তরের ধ্যানের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ায়।

ত্যাগ করব না, রক্ষা করব, কিন্তু ঠিক জায়গায় রক্ষা করব। ছোটকে বড় করে তুল্‌ব না, শ্রেয়কে প্রেয়ের আসনে বস্‌তে দেবনা এবং সকল সময়ে সকল কর্ম্মেই অন্তরের গূঢ় কক্ষের অচল দরবারে উপাসনাকে চল্‌তে দেব—তিনি নেই এমন কথাটাকে কোনো সময়েই কোনোমতেই মনকে বুঝতে দেবনা—কেননা সেটা একেবারেই মিথ্যা কথা।

প্রভাতে একান্ত ভক্তিতে তাঁর চরণের ধূলি মনের ভিতরে তুলে নিয়ে যাও—সেই আমাদের পরশরতন। আমাদের হাসিখেলা আমাদের কাজকর্ম্ম আমাদের বিষয় আশয় যা

কিছু আছে তার উপর সেই ভক্তি ঠেকিয়ে দাও—আপনিই সমস্ত বড় হয়ে উঠ্‌বে, সমস্ত পবিত্র হয়ে উঠ্‌বে—সমস্তই তাঁর সম্মুখে উৎসর্গ করে দেবার যোগ্য হয়ে দাঁড়াবে।

১২ই ফাল্গুন

অভ্যাস

যিনি পরম চৈতন্যস্বরূপ তাঁকে আমরা নির্ম্মল চৈতন্যের দ্বারাই অন্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করব এই রয়েছে কথা। তিনি আর কোনোরকমে সস্তায় আমাদের কাছে ধরা দেবেন না—এতে যতই বিলম্ব হোক্। সেই জন্যেই তাঁর দেখা দেওয়ার অপেক্ষায় কোনো কাজ বাকি নেই—আমাদের আহার ব্যবহার প্রাণন মনন সমস্তই চল্‌চে। আমাদের জীবনের যে বিকাশ তাঁর দর্শনে গিয়ে পরি-সমাপ্ত সে ধীরে ধীরে হোক্ বিলম্বে হোক্, সে জন্যে তিনি কোনো অস্ত্রধারী পেয়াদাকে দিয়ে তাগিদ পাঠাচ্চেন না ;—সেটি একটি পরিপূর্ণ সামগ্রী কি না, অনেক রৌদ্রবৃষ্টির পরম্পরায়, অনেক দিন ও রাত্রির শুশ্রূষায় তার হাজারটি দল একটি বৃন্তে ফুটে উঠ্‌বে।

সেই জন্যে মাঝে মাঝে আমার মনে এই সংশয়টি আসে যে, এই যে আমরা প্রাতঃকালে উপাসনার জন্যে অনেকে সমবেত হয়েছি, এখানে আমরা অনেক সময়েই অনেকেই আমাদের সম্পূর্ণ চিত্তটিকে ত আনতে পারিনে—তবে এ কাজটি কি আমাদের ভাল হচ্চে? নির্ম্মল চৈতন্যের স্থানে অচেতনপ্রায় অভ্যাসকে নিযুক্ত করায় আমরা কি অন্যায় করচিনে?

আমার মনে এক এক সময় অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়,—মনে ভাবি যিনি আপনাকে প্রকাশ করবার জন্যে আমাদের ইচ্ছার উপর কিছুমাত্র জবরদস্তি করেন না তাঁর উপাসনায় পাছে আমরা লেশমাত্র অনিচ্ছাকে নিয়ে আসি—পাছে এখানে আসবার সময় কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ করি—কিছুমাত্র আলস্যের বাধা ঘটে—পাছে তখন কোনো আমোদের বা কাজের আকর্ষণে আমাদের ভিতরে ভিতরে একটা বিমুখতার সৃষ্টি করে।

উপাসনায় শৈথিল্য করলে, অন্য যাঁরা উপাসনা করেন তাঁরা যদি কিছু মনে করেন, যদি কেউ নিন্দা করেন বা বিরক্ত হন পাছে এই তাগিদ-টাই সকলের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে! সেই জন্যে এক এক সময়ে বলতে ইচ্ছা করে মন সম্পূর্ণ অনুকূল সম্পূর্ণ ইচ্ছুক না হলে এ জায়গায় কেউ এসো না।

কিন্তু সংসারটা যে কি জিনিষ তা যে জানি। এ সংসারের অনেকটা পথ মাড়িয়ে আজ বার্দ্ধক্যের দ্বারে এসে উত্তীর্ণ হয়েছি। জানি দুঃখ কাকে বলে, আঘাত কি প্রচণ্ড, বিপদ কেমন অভাবনীয়। যে সময়ে আশ্রয়ের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি সেই সময়ে আশ্রয় কিরূপ দুর্লভ! তিনিহীন জীবন যে অত্যন্ত গৌরবহীন; চারদিকেই তাকে টানা-টানি করে মারে;—দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সুর নেবে যায়, তার কথা, চিন্তা, কাজ, তুচ্ছ হয়ে আসে। সে জীবন যেন অনাবৃত—সে

এবং তার বাইরের মাঝখানে কেউ যেন তাকে ঠেকাবার নেই—ক্ষতি একেবারেই তার গায়ে এসে লাগে, নিন্দা একেবারেই তার মর্ম্মে এসে আঘাত করে, দুঃখ কোনো ভাবরসের মাঝখান দিয়ে সুন্দর বা মহৎ হয়ে ওঠে না ;—সুখ একেবারে মত্ততা এবং শোকের কারণ একেবারে মৃত্যুবাণ হয়ে এসে তাকে বাজে। এ কথা যখন চিন্তা করে দেখি তখন সমস্ত সংকোচ মন হতে দূর হয়ে যায়—তখন ভীত হয়ে বলি, না, শৈথিল্য করলে চল্‌বে না—একদিনও ভুল্‌বো না, প্রতিদিনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই হবে—প্রতিদিন কেবল সংসার-কেই প্রশ্রয় দিয়ে তাকেই কেবল বুকের সমস্ত রক্ত খাইয়ে প্রবল করে তুলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে একান্তই তার হাতে আপাদমস্তক সমর্পণ করে দেবনা—দিনের মধ্যে অন্তত একবার এই কথাটা প্রত্যহই বলে যেতে হবে তুমি সংসারের চেয়ে বড় তুমি সকলের চেয়ে বড়।

যেমন করে পারি তেমনি করেই বল্‌ব। আমাদের শক্তি ক্ষুদ্র অন্তর্যামী তা জানেন—কোনোদিন আমাদের মন কিছু জাগে কোনো-দিন একেবারেই জাগেনা—মনে বিক্ষেপ আসে, মনে ছায়া পড়ে। উপাসনার যে মন্ত্র আবৃত্তি করি প্রতিদিন তার অর্থ উজ্জ্বল থাকে না। কিন্তু তবু নিষ্ঠা হারাব না—দিনের পর দিন এই দ্বারে এসে দাঁড়াব—দ্বার খুলুক্ আর নাই খুলুক্। যদি এখানে আস্‌তে কষ্ট বোধ হয় তবে সেই কষ্টকে অতিক্রম করেই আস্‌ব—যদি সংসারের কোনো বন্ধন মনকে টেনে রাখ্‌তে চায় তবে ক্ষণকালের জন্যে সেই সংসারকে এক পাশে ঠেলে রেখেই আস্‌ব।

কিছু নাই জোটে যদি তবে এই অভ্যাস-টুকুকেই প্রত্যহ তাঁর কাছে এনে উপস্থিত করব। সকলের চেয়ে যেটা কম দেওয়া অন্তত সেই দেওয়াটাও তাঁকে দেব। সেইটুকু দিতেও যে বাধাটা অতিক্রম করতে হয় যে

জড়ত্ব মোচন করতে হয় সেটাতেও যেন কুণ্ঠিত না হই। অত্যন্ত দরিদ্রের যে রিক্ত-প্রায় দান সেও যেন প্রত্যহই নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর কাছে এনে দিতে পারি। যাঁকে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করবার কথা—দিনের সকল কর্ম্মে সকল চিন্তায় যাঁকে রাজা করে বসিয়ে রাখ্‌তে হবে—তাঁকে কেবল মুখের কথা দেওয়া! কিন্তু তাও দিতে হবে। আগাগোড়া সমস্তই কেবল সংসারকে দেব আর তাঁকে কিছুই দেব না, তাঁকে প্রত্যেক দিনের মধ্যে একান্তই "না" করে রেখে দেব এ ত কোনোমতেই হতে পারে না।

দিনের আরম্ভে প্রভাতের অরুণোদয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই কথাটা একবার স্বীকার করে যেতেই হবে—যে, "পিতানোঽসি"—তুমি পিতা, আছ। আমি স্বীকার করচি, তুমি পিতা, আমি স্বীকার করচি তুমি আছ। একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে

কেবল এই কথাটি বলে যাবার জন্যে তোমাদের সংসার ফেলে চলে আস্‌তে হবে। কেবল সেইটুকু সময় থাক্ তোমাদের কাজকর্ম্ম, থাক্ তোমাদের আমোদপ্রমোদ! আর সমস্ত কথার উপরে এই কথাটি বলে যাও—পিতানোঽসি।

তাঁর জগৎসংসারের কোলে জন্মে', তাঁর চন্দ্রসূর্য্যের আলোর মধ্যে চোখ মেলে জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে এই কথাটি তোমাদের জোড়-হাতে প্রত্যহ বলে যেতে হবে—"ওঁ পিতানোঽসি"—এ আমি তোমাদের জোর করেই বলে রাখ্‌চি। এত বড় বিশ্বে এবং এমন মহৎ মানবজীবনে তাঁকে কোনো জায়গাতেই এক্‌টুও স্বীকার করবে না—এ ত কিছুতেই হতে পারবে না। তোমার অপরিস্ফুট চেতনাকেও উপহার দাও, তোমার শূন্য হৃদয়কেও দান কর, তোমার শুষ্কতা রিক্ততাকেই তাঁর সম্মুখে ধর—তোমার সুগভীর দৈন্যকেই তাঁর কাছে নিবেদন কর—তাহলেই যে দয়া অযাচিত-

ভাবে প্রতিমুহূর্তেই তোমার উপরে বর্ষিত হচ্চে সেই দয়া ক্রমশই উপলব্ধি করতে থাকবে—এবং প্রত্যহ ঐ যে অল্প একটু বাতায়ন খুল্‌বে সেইটুকু দিয়েই অন্তর্যামীর প্রেমমুখের প্রসন্ন হাস্য প্রত্যহই তোমার অন্তরকে জ্যোতিতে অভিষিক্ত করতে থাকবে।

১৩ই ফাল্গুন

প্রার্থনা

হে সত্য, আমার এই অন্তরাত্মার মধ্যেই যে তুমি অন্তহীন সত্য—তুমি আছ। এই আত্মায় তুমি আছ যে—দেশে কালে গভীরতায় নিবিড়তায় তার আর সীমা নাই। এই আত্মা অনন্তকাল এই মন্ত্রটি বলে' আস্‌চে—সত্যং! তুমি আছ—তুমিই আছ। আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা হতে এই যে মন্ত্রটি উঠ্‌চে—তা যেন আমার মনের এবং সংসারের অন্যান্য সমস্ত শব্দকে ভরে' সকলের উপরে জেগে ওঠে—সত্যং সত্যং সত্যং। সেই সত্যে আমাকে নিয়ে যাও—সেই আমার অন্তরাত্মার গূঢ়তম অনন্ত সত্যে—যেখানে "তুমি আছ" ছাড়া আর কোনো কথাটি নেই।

হে জ্যোতির্ম্ময়—আমার চিদাকাশে তুমি জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ—তোমার অনন্ত আকাশের

কোটি সূর্য্যলোকে সে জ্যোতি কুলোয় না— সেই জ্যোতিতে আমার অন্তরাত্মা চৈতন্তে সমুদ্ভাসিত। সেই আমার অন্তরাকাশের মাঝখানে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে আদ্যোপান্ত প্রদীপ্ত পবিত্রতায় ক্ষালন করে ফেল—আমাকে জ্যোতির্ম্ময় কর—আমার অন্য সমস্ত পরিবেষ্টনকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে সেই শুভ্র শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ জ্যোতিঃশরীরকে লাভ করি!

হে অমৃতস্বরূপ—আমার অন্তরাত্মার নিভৃত ধামে তুমি আনন্দং পরমানন্দং। সেখানে কোনোকালেই তোমার মিলনের অন্ত নেই। সেখানে তুমি কেবল আছ না তুমি মিলেছ— সেখানে তোমার কেবল সত্য নয় সেখানে তোমার আনন্দ। সেই তোমার অনন্ত আনন্দকে তোমার জগৎসংসারে ছড়িয়ে দিয়েছ—গতিতে প্রাণে সৌন্দর্য্যে সে আর কিছুতে ফুরোয় না—অনন্ত আকাশে তাকে

আর কোথাও ধরে না! সেই তোমার সীমাহীন আনন্দকেই আমার অন্তরাত্মার উপরে স্তব্ধ করে রেখেছি—সেখানে তোমার সৃষ্টির কাউকে প্রবেশ করতে দাওনি—সেখানে আলোক নেই, রূপ নেই, গতি নেই—কেবল নিস্তব্ধ নিবিড় তোমার আনন্দ রয়েছে। সেই আনন্দধামের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একবার ডাক দাও প্রভু—আমি যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছি—তোমার অমৃত আহ্বান আমার সংসারের সর্ব্বত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক্—ক্ষতি দূরে চলে যাক্ অতি গোপনে প্রবেশ করুক্—সকল দিক্ থেকেই আমি যেন যাই যাই বলে সাড়া দিই—ডাক্ দাও—ওরে আয় আয়, ওরে ফিরে আয়, চলে আয়। এই অন্তরাত্মার অনন্ত আনন্দধামে আমার যা কিছু সমস্তই এক জায়গায় এক হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে চুপ করে বসুক, খুব গভীরে খুব গোপনে।

হে প্রকাশ, তোমার প্রকাশের দ্বারা

আমাকে একেবারে নিঃশেষ করে ফেল—আমার আর কিছুই বাকি রেখোনা—কিছুই না, অহঙ্কারের লেশমাত্র না—আমাকে একেবারেই তুমিময় করে তোলো। কেবলি তুমি, তুমি, তুমিময়! কেবলি তুমিময় জ্যোতি, কেবলি তুমিময় আনন্দ!

হে রুদ্র, পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হয়ে যাক্—তোমার প্রচণ্ড তাপ বিকীর্ণ কর—কোথাও কিছু লুকিয়ে না থাকুক্—শিকড় থেকে বীজভরা ফল পর্য্যন্ত সমস্ত দগ্ধ হয়ে যাক্—এ যে বহুদিনের বহু হুশ্চেষ্টার ফল—শাখার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে পাতার আড়ালে আড়ালে ফলে রয়েছে—শিকড় হৃদয়ের রসাতল পর্য্যন্ত নেমে গিয়েছে—তোমার রুদ্রতাপের এমন ইন্ধন আর নেই—যখন দগ্ধ হবে তখনই এ সার্থক হতে থাক্‌বে—তখন আলোকের মধ্যে তার অন্ত হবে।

তার পরে হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা

আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে বিকীর্ণ হতে থাক্‌—আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরমপুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক—জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক—তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক্‌, হৃদয়কে পবিত্র করুক্‌, শক্তিকে মঙ্গল করুক্‌—তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদ-সঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক্‌—তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবন পথের সম্বল হয়ে থাক। আমারই অন্তরাত্মার মধ্যে তোমার যে সত্য, যে জ্যোতি, যে অমৃত, যে প্রকাশ রয়েছে তোমার প্রসন্নতার দ্বারা যখন তাকে উপলব্ধি করব তখনি রক্ষা পাব।

১৪ই ফাল্গুন

বৈরাগ্য

যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন, ন বা অরে পুত্রস্য কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি— আত্মনস্তু কামায় পুত্রঃ প্রিয়ো ভবতি।

অর্থাৎ, পুত্রকে কামনা করচ বলেই যে পুত্র তোমার প্রিয় হয় তা নয় কিন্তু আত্মাকেই কামনা করচ বলে পুত্র প্রিয় হয়।

এর তাৎপর্য্য হচ্চে এই যে, আত্মা পুত্রের মধ্যে আপনাকেই অনুভব করে বলেই পুত্র তার আপন হয়, এবং সেই জন্যেই পুত্রে তার আনন্দ।

আত্মা যখন স্বার্থ এবং অহঙ্কারের গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একলা হয়ে থাকে তখন সে বড়ই ম্লান হয়ে থাকে—তখন তার সত্য স্ফূর্ত্তি পায় না। এই জন্যেই আত্মা পুত্রের মধ্যে মিত্রের মধ্যে নানা লোকের মধ্যে

নিজেকে উপলব্ধি করে আনন্দিত হতে থাকে কারণ তার সত্য পূর্ণতর হয়ে উঠ্‌তে থাকে।

ছেলেবেলায় বর্ণপরিচয়ে যখন ক খ গ প্রত্যেক অক্ষরকে স্বতন্ত্র করে শিখ্‌ছিলুম তখন তাতে আনন্দ পাইনি। কারণ, এই স্বতন্ত্র অক্ষরগুলির কোনো সত্য পাচ্ছিলুম না। তার পরে অক্ষরগুলি যোজনা করে যখন "কর" "খল" প্রভৃতি পদ পাওয়া গেল তখন অক্ষর আমার কাছে তার তাৎপর্য্য প্রকাশ করাতে আমার মন কিছু কিছু সুখ অনুভব করতে লাগল। কিন্তু এরকম বিচ্ছিন্ন পদগুলি চিত্তকে যথেষ্ট রস দিতে পারে না—এ'তে ক্লেশ এবং ক্লান্তি এসে পড়ে। তার পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে যেদিন "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" বাক্যগুলি পড়েছিলুম সেদিন ভারি আনন্দ হয়েছিল, কারণ, শব্দগুলি তখন পূর্ণতর অর্থে ভরে উঠল। এখন শুদ্ধমাত্র "জল পড়ে" "পাতা নড়ে" আবৃত্তি করতে মনে সুখ হয়

না, বিরক্তিবোধ হয়—এখন ব্যাপক অর্থযুক্ত বাক্যাবলীর মধ্যেই শব্দবিন্যাসকে সার্থক বলে উপলব্ধি করতে চাই।

বিচ্ছিন্ন আত্মা তেমনি বিচ্ছিন্ন পদের মত। তার একার মধ্যে তার তাৎপর্য্যকে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এই জন্যেই আত্মা নিজের সত্যকে নানার মধ্যে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। সে যখন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন সে নিজের সার্থকতার একটা রূপ দেখ্‌তে পায়—সে যখন আত্মীয় পরকীয় বহুতর লোককে আপন করে জানে তখন সে আর ছোট আত্মা থাকে না, তখন সে মহাত্মা হয়ে ওঠে।

এর একমাত্র কারণ, আত্মার পরিপূর্ণ সত্যটি আছে পরমাত্মার মধ্যে। আমার আমি সেই একমাত্র মহা আমিতেই সার্থক—এই জন্যে সে জেনে এবং না জেনেও সেই পরম আমিকেই খুঁজচে। আমার আমি যখন

পুত্রের আমিতে গিয়ে সংযুক্ত হয় তখন কি ঘটে? তখন, যে পরম আমি আমার আমির মধ্যেও আছেন, পুত্রের আমির মধ্যেও আছেন তাঁকে উপলব্ধি করে আমার আনন্দ হয়।

কিন্তু তখন মুস্কিল হয় এই যে, আমার আমি এই উপলক্ষ্যে যে সেই বড় আমির কাছেই একটুখানি এগোলো তা সে স্পষ্ট বুঝতে পারে না—সে মনে করে সে পুত্রকেই পেল এবং পুত্রের কোনো বিশেষ গুণবশতই পুত্র আনন্দ দেয়। সুতরাং এই আসক্তির বন্ধনেই সে আট্‌কা পড়ে যায়। তখন সে পুত্র-মিত্রকে কেবলি জড়িয়ে বসে থাক্‌তে চায়। তখন সে এই আসক্তির টানে অনেক পাপেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।

এই জন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বৈরাগ্য উদ্রেক করবার জন্যেই যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌চেন আমরা যথার্থতঃ পুত্রকে চাইনে আত্মাকেই চাই। এ কথাটিকে ঠিক মত বুঝলেই পুত্রের প্রতি আমাদের মুগ্ধ আসক্তি দূর হয়ে যায়। তখন

উপলক্ষ্যই লক্ষ্য হয়ে আমাদের পথরোধ করতে পারে না।

যখন আমরা সাহিত্যের বৃহৎ তাৎপর্য্য বুঝে আনন্দ বোধ করতে থাকি—তখন প্রত্যেক কথাটি স্বতন্ত্রভাবে আমি আমি করে আমাদের মনকে আর বাধা দেয় না—প্রত্যেক কথা অর্থকেই প্রকাশ করে নিজেকে নয়—তখন কথা আপনার স্বাতন্ত্র্য যেন বিলুপ্ত করে দেয়।

তেমনি যখন আমরা সত্যকে জানি তখন সেই অখণ্ড সত্যের মধ্যেই সমস্ত খণ্ডতাকে জানি—তারা স্বতন্ত্র হয়ে উঠে আর আমার জ্ঞানকে আটক করে না। এই অবস্থাই বৈরাগ্যের অবস্থা। এই অবস্থায় সংসার আপনাকেই চরম বলে, আমাদের সমস্ত মনকে কর্ম্মকে গ্রাস করতে থাকে না।

কোনো কাব্যের তাৎপর্য্যের উপলব্ধি যখন আমাদের কাছে গভীর হয় উজ্জ্বল হয় তখনই

তার প্রত্যেক শব্দের সার্থকতা সেই সমগ্র ভাবের মাধুর্যে আমাদের কাছে বিশেষ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে। তখন যখন ফিরে দেখি দেখতে পাই কোনো শব্দটিই নিরর্থক নয়—সমগ্রের রসটি প্রত্যেক পদের মধ্যেই প্রকাশ পাচ্চে। তখন সেই কাব্যের প্রত্যেক পদটিই আমাদের কাছে বিশেষ আনন্দ ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে ওঠে। তখন তার পদগুলি সমগ্রের উপলব্ধিতে আমাদের বাধা না দিয়ে সহায়তা করে বলেই আমাদের কাছে বড়ই মূল্যবান হয়ে ওঠে।

তেমনি বৈরাগ্যে যখন স্বাতন্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূমার মধ্যে আমাদের মহাসত্যের পরিচয় সাধন করিয়ে দেয়—তখন সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্ত্র্য সেই ভূমার রসে রসপরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিন যাদের বানান করে পড়তে হচ্ছিল, যারা পদে পদে আমাদের পথ রোধ করছিল—তারা

প্রত্যেকে সেই ভূমার প্রতিই আমাদের বহন করে, রোধ করে না।

তখন যে আনন্দ সেই আনন্দই প্রেম। সেই প্রেমে বেঁধে রাখে না—সেই প্রেমে টেনে নিয়ে যায়। নির্মল নির্বাধ প্রেম। সেই প্রেমই মুক্তি—সমস্ত আসক্তির মৃত্যু। এই মৃত্যুরই সংকার মন্ত্র হচ্চে—

মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ—
মধু নক্তম্ উতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ।

বায়ু মধু বহন করচে—নদীসিন্ধুসকল মধু ক্ষরণ করচে—ওষধি বনস্পতি সকল মধুময় হোক্, রাত্রি মধু হোক্, ঊষা মধু হোক্, পৃথিবীর ধূলি মধুমৎ হোক্, সূর্য্য মধুমান হোক্!

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জলস্থল আকাশ, জড়জন্তু মনুষ্য সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

আসক্তি আমাদের চিত্তকে বিষয়ে আবদ্ধ করে—চিত্ত যখন সেই বিষয়ের ভিতরে বিষয়াতীত সত্যকে লাভ করে তখন প্রজাপতি যেমন গুটি কেটে বের হয় তেমনি সে বৈরাগ্য দ্বারা আসক্তি বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে—আসক্তি ছিন্ন হয়ে গেলেই পূর্ণ সুন্দর প্রেম আনন্দরূপে সর্ব্বত্রই প্রকাশ পায়। তখন "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" এই মন্ত্রের অর্থ বুঝতে পারি—যা কিছু প্রকাশ পাচ্চে সমস্তই সেই আনন্দরূপ সেই অমৃতরূপ—কোনো বস্তুই তখন আমি প্রকাশ হচ্চি বলে আর অহঙ্কার করে না—প্রকাশ হচ্চেন কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ—সেই প্রকাশের মৃত্যু নেই—মৃত্যু অঙ্গ সমস্তের কিন্তু সেই প্রকাশই অমৃত।

১৫ই ফাল্গুন ১৩১৫

বিশ্বাস

সাধনা আরম্ভে প্রথমেই সকলের চেয়ে একটি বড় বাধা আছে—সেইটি কাটিয়ে উঠ্‌তে পার্‌লে অনেকটা কাজ এগিয়ে যায়।

সেটি হচ্চে প্রত্যয়ের বাধা। অজ্ঞাত-সমুদ্র পার হয়ে একটি কোনো তীরে গিয়ে ঠেকবই এই নিশ্চিত প্রত্যয়ই হচ্চে কলম্বসের সিদ্ধির প্রথম এবং মহৎ সম্বল। আরো অনেকেই আট্‌লান্টিক্ পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় পৌঁছতে পারত—কিন্তু তাদের দীনচিত্তে ভরসা ছিল না—তাদের বিশ্বাস উজ্জ্বল ছিল না যে, কূল আছে; এইখানেই কলম্বসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য।

আমরাও অধিকাংশ লোক সাধনাসমুদ্রে যে পাড়ি জমাইনে, তার প্রধান কারণ আমাদের অত্যন্ত নিশ্চিত প্রত্যয় জন্মেনি যে সে সমুদ্রের

পার আছে। শাস্ত্র পড়েছি, লোকের কথাও শুনেছি, মুখে বলি হাঁ হাঁ বটে বটে, কিন্তু মানবজীবনের যে একটা চরম লক্ষ্য আছে সে প্রত্যয় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয় নি। এই জন্য ধর্ম্মসাধনটা নিতান্তই বাহ্যব্যাপার, নিতান্তই দশজনের অনুকরণ মাত্র হয়ে পড়ে। আমাদের সমস্ত আন্তরিক চেষ্টা তাতে উদ্বোধিত হয় নি।

এই বিশ্বাসের জড়তাবশতই লোককে ধর্ম্ম-সাধনে প্রবৃত্ত করতে গেলে আমরা তাকে প্রতারণা করতে চেষ্টা করি—আমরা বলি এ'তে পুণ্য হবে। পুণ্য জিনিষটা কি? না, পুণ্য হচ্চে একটি হ্যাণ্ড্‌নোট্ যাতে ভগবান আমাদের কাছে ঋণ স্বীকার করেছেন—কোনো একরকম টাকায় তিনি কোনো এক সময়ে সেটা পরিশোধ করে দেবেন।

এই রকম একটা সুস্পষ্ট পুরস্কারের লোভ আমাদের স্থূল প্রত্যয়ের অনুকূল। কিন্তু

সাধনার লক্ষ্যকে এই রকম বহির্বিষয় করে তুলে তার পথও ঠিক অন্তরের পথ হয় না, তার লাভও অন্তরের লাভ হয় না— সে একটা পার-লৌকিক বৈষয়িকতার সৃষ্টি করে। সেই বৈষয়িকতা অন্যান্য বৈষয়িকতার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

কিন্তু সাধনার লক্ষ্য হচ্চে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। সে লক্ষ্য কখনই বাহিরের কোনো স্থান নয়, যেমন স্বর্গ; বাহিরের কোনো পদ নয়, যেমন ইন্দ্রপদ; এমন কিছুই নয় যাকে দূরে গিয়ে সন্ধান করে বের করতে হবে, যার জন্যে পাণ্ডা পুরোহিতের শরণাপন্ন হতে হবে। এ কিছুতে হতেই পারে না।

মানবজীবনের চরম লক্ষ্য কি এই প্রশ্নটি নিজেকে জিজ্ঞাসা করে নিজের কাছ থেকে এর একটি স্পষ্ট উত্তর বের করে নিতে হবে। কারো কোনো শোনা কথায় এখানে কাজ চলবে না—কেন না এটি কোনো ছোট

কথা নয়, এটি একেবারে শেষ কথা—এটিকে যদি নিজের অন্তরাত্মার মধ্যে না পাই তবে বাইরে খুঁজে পাব না।

এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমি এসে দাঁড়িয়েছি এটি একটি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার। এর চেয়ে বড় ব্যাপার আর কিছু নেই। আশ্চর্য্য এই আমি এসেছি—আশ্চর্য্য এই চারিদিক!

এই যে আমি এসে দাঁড়িয়েছি—কেবল খেয়ে ঘুমিয়ে গল্প করে কি এই আশ্চর্য্যটাকে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই কি এ'কে প্রতিমুহূর্ত্তে অপমানিত করবে এবং শেষ মুহূর্ত্তে মৃত্যু এসে এ'কে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে?

এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মাঝখানটিতে দাঁড়িয়ে নিজের অন্তরাকাশের চৈতন্যলোকের মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে নিজেকে প্রশ্ন কর—কেন? এ সমস্ত কি জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর জল স্থল

আকাশের কোথাও নেই—এ প্রশ্নের উত্তর নিজের অন্তরের মধ্যে নিহিত হয়ে রয়েছে।

এর একমাত্র উত্তর হচ্চে আত্মাকে পেতে হবে। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কথা নেই। আত্মাকেই সত্য করে পূর্ণ করে জান্‌তে হবে।

আত্মাকে যেখানে জান্‌লে সত্য জানা হয় সেখানে আমরা দৃষ্টি দিচ্চিনে। এই জন্যে আত্মাকে জানা বলে যে একটা পদার্থ আছে এই কথাটা আমাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেই এসে পৌঁছয় না।

আত্মাকে আমরা সংসারের মধ্যেই জান্‌তে চাচ্চি। তাকে কেবলি ঘর দুয়োর ঘটিবাটির মধ্যেই জানছি। তার বেশি তাকে আমরা জানিইনে—এই জন্যে তাকে পাচ্চি আর হারাচ্চি, কেবল কাঁদচি আর ভয় পাচ্চি। মনে করচি এটা না পেলেই আমি মলুম, আর ওটা পেলেই একেবারে ধন্য হয়ে গেলুম। এটাকে

এবং ওটাকেই প্রধান করে জান্‌চি, আত্মাকে তার কাছে খর্ব্ব করে সেই প্রকাণ্ড দৈন্যের বোঝাকেই ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে বহন করচি।

আত্মাকে সত্য করে জান্‌লেই আত্মার সমস্ত ঐশ্বর্য্যলাভ হয়। মৃত্যুর সামগ্রীর মধ্যে অহরহ তাকে জড়িত করে তাকে শোকের বাষ্পে ভয়ের অন্ধকারে লুপ্তপ্রায় করে দেখার দুর্দ্দিন কেটে যায়। পরমাত্মার মধ্যেই তার পরিপূর্ণ সত্য পরিপূর্ণ স্বরূপ প্রকাশ পায়—সংসারের মধ্যে নয়, বিষয়ের মধ্যে নয়, তার নিজের অহঙ্কারের মধ্যে নয়।

আত্মা সত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে নিজেকে জান্‌বে—সেই পরম উপলব্ধি দ্বারা সে বিনাশকে একেবারে অতিক্রম করবে। সে জ্ঞানজ্যোতির নির্ম্মলতার মধ্যেই নিজেকে জান্‌বে। কামক্রোধলোভ যে সমস্ত বিকারের অন্ধকার রচনা করে, তার থেকে আত্মা বিশুদ্ধ শুভ্রনির্ম্মুক্ত পবিত্রতার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে

উঠ্‌বে—এবং সর্ব্বপ্রকার আসক্তির মৃত্যুবন্ধন থেকে প্রেমের অমৃতলোকে মুক্তিলাভ করে সে নিজেকে অমর বলেই জান্‌বে। সে জান্‌বে কার প্রকাশের মধ্যে তার প্রকাশ সত্য—সেই আবিঃ সেই প্রকাশস্বরূপকেই সে আত্মার পরম প্রকাশ বলে নিজের সমস্ত দৈন্য দূর করে দেবে এবং অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই একটি প্রসন্নতা লাভ করে সে স্পষ্ট জান্‌তে পারবে সে চিরদিনের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। সমস্ত ভয় হতে, সমস্ত শোক হতে, সমস্ত ক্ষুদ্রতা হতে রক্ষা পেয়েছে।

আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে লাভ করাই যে জীবনের চরম লক্ষ্য এই লক্ষ্যটিকে একান্ত প্রত্যয়ের সঙ্গে একাগ্রচিত্তে স্থির করে নিতে হবে। দেখ, দেখ, নিরীক্ষণ করে দেখ, সমস্ত চেষ্টাকে স্তব্ধ করে সমস্ত মনকে নিবিষ্ট করে নিরীক্ষণ করে দেখ। একটি চাকা কেবলি ঘুরচে তারই মাঝখানে একটি বিন্দু স্থির হয়ে

আছে সেই বিন্দুটিকে অর্জ্জুন বিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে পেয়েছিলেন। তিনি চাকার দিকে মন দেননি বিন্দুর দিকেই সমস্ত মন সংহত করেছিলেন। সংসারের চাকা কেবলি ঘুরচে, লক্ষ্যটি তার মাঝখানে ধ্রুব হয়ে আছে—সেই ধ্রুবের দিকেই মন দিয়ে লক্ষ্য স্থির করতে হবে, চলার দিকে নয়। লক্ষ্যটি যে আছে সেটা নিশ্চয় করে দেখে নিতে হবে—চাকার ঘূর্ণা-গতির মধ্যে দেখা বড় শক্ত—কিন্তু সিদ্ধি যদি চাই প্রথমে লক্ষ্যটিকে স্থির যেন দেখ্‌তে পারি।

১৬ই ফাল্গুন ১৩১৫

সংহরণ

আমাদের সাধনার দ্বিতীয় বড় বাধা হচ্চে সাধনার অনভ্যাস। কোনো রকম সাধনাতেই হয় ত আমাদের অভ্যাস হয় নি। যখন যেটা আমাদের সমুখে এসেছে সেইটের মধ্যেই হয় ত আমরা আকৃষ্ট হয়েছি—যেমন-তেমন করে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যেখানে সেখানে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে আমরা চলে যাচ্চি। সংসারের স্রোত আমাদের বিনা চেষ্টাতেই চল্‌চে বলেই আমরা চল্‌চি—আমাদের দাঁড়ও নেই, হালও নেই, পালও নেই।

কোনো একটি উদ্দেশ্যের একান্ত অনুগত করে শক্তিকে প্রবৃত্তিকে চতুর্দ্দিক হতে সংগ্রহ করে আনা আমরা চর্চ্চাই করি নি। এই জন্যে তারা সকলেই হাতের বার হয়ে যাবার জো হয়েছে। কে কোথায় যে আছে তার ঠিকানা

নেই—ডাক দিলেই যে ছুটে আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। যে সব খাদ্য তাদের অভ্যস্ত এবং রুচিকর তারই প্রলোভন পেলে তবেই তারা আপনি জড় হয় নইলে কিছুতেই নয়।

নিজেকে চারিদিকে কেবল ছড়াছড়ি করাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে—চিন্তাও ছড়িয়ে পড়ে, কর্ম্মও এলিয়ে যায়, কিছুই আঁট বাঁধে না।

এরকম অবস্থায় যে কেবল সিদ্ধি নেই তা নয়, সত্যকার সুখও নেই। এ'তে কেবল জড়তার তামসিক আবেশমাত্র।

কারণ যখন আমাদের শক্তিকে প্রবৃত্তিকে কোনো উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দিই তখন সেই উদ্দেশ্যই তাদের বহন করে নিয়ে চলে—তখন তাদের ভার আর আমাদের নিজের ঘাড়ে পড়ে না। নতুবা তাদের বহন করে একবার এর উপর রাখ্‌ছি একবার তার উপর রাখ্‌চি এমনি করে কেবলি টানাটানি করে নিয়ে বেড়াতে হয়। যখন কোথাও নামিয়ে রাখবার

কোনো উপায় না পাই তখন কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করতে থাকি। কতই বাজে খেলা, বাজে আমোদ, বাজে উপকরণ। অবশেষে সেই কৃত্রিম আয়োজন গুলোও দ্বিতীয় বোঝা হয়ে আমাদের চতুর্দ্দিকে চেপে ধরে। এমনি করে জীবনের ভার কেবলি জমে উঠ্‌তে থাকে, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত কোনোমতেই তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাইনে।

তাই বল্‌ছিলুম কেবলমাত্র সাধনার অবস্থা-তেই একটা আনন্দ আছে সিদ্ধির কথা দূরে থাক্। মহৎলক্ষ্য অনুসরণে নিজের বিক্ষিপ্ত-তাকে একাগ্র করে এনে তাকে এক পথে চালনা করলে তাতেই যেন প্রাণ বেঁচে যায়। যে টুকু সচেষ্টতা থাক্‌লে আমরা সাধনাকে আনন্দ বলে কোমর বেঁধে বক্ষ প্রসারিত করে প্রবৃত্ত হতে পারি সেটুকুও যদি আমাদের ভিতর থেকে ক্ষয়ে গিয়ে থাকে তবে বড় বিপদ। যেমন করে হোক্, বারম্বার স্খলিত হয়েও

সেই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করবার চেষ্টাকে শক্ত করে তুল্‌তে হবে। শিশু যেমন পড়তে পড়তে আঘাত পেতে পেতে চল্‌তে শেখে তেমনি করেই তাকে চল্‌তে শেখাতে হবে। কেননা সিদ্ধিলাভে প্রথমে লক্ষ্যটা যে সত্য সেই বিশ্বাসটি জাগানো চাই, তার পরে লক্ষ্যটি বাইরে না ভিতরে, পরিধিতে না কেন্দ্রে সেটি জানা চাই তার পরে চাই সোজা পথ বেয়ে চল্‌তে শেখা। স্থৈর্য্য এবং গতি দুই চাই। বিশ্বাসে চিত্ত স্থির হবে—এবং সাধনায় চেষ্টা গতি লাভ করবে।

১৯ই ফাল্গুন ১৩১৫

নিষ্ঠা

যখন সিদ্ধির মূর্ত্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য! তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্ব্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্ত্তি ত নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও ত সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন ত আর ভাবনা থাকে না—তখন ত পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না—তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চল্‌তে হয় তাদের বাহন হচ্চে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র সৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্চে না তবু চল্‌চে। পানীয় রস পাচ্চে না তবু চল্‌চে—বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চল্‌চে—নিঃশব্দে চল্‌চে।—যখন মনে হয় সাম্‌নে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনো তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মত ছুটে আসে—তখন

সে ধূলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মত এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে ?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনায় মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে —সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়, হৃদয়কে ডাকাডাকি করি হৃদয় সাড়া দেয় না—কেবলি মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্চি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চল্‌তে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্চেই অগ্রসর হচ্চেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আস্‌চে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ঐ দেখ হঠাৎ এক-

দিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস্ দেখা দেয় —সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুরতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জ্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা— সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্চে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা ত বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি গুণ আছে ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখতে পারে—ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি—কিন্তু নিষ্ঠা হচ্চে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্চে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে

তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করেনা। এই আমাদের মরু-পথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহঙ্কার করে না, কোনো দাবী করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

১৭ই ফাল্গুন

নিষ্ঠার কাজ

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালন করে নিয়ে যায় তা নয় – সে আমাদের কেবলি সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চল্‌তে চল্‌তে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আস্‌তে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুল্‌তে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কি হচ্চে! এ কি করচ! সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্চে পিপাসার সময় উপায় কি হবে!

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা

হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় এই যে জিনিষটা এমন করে ফেলা ছড়া করচ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে—একটু চুপ কর, একটু স্থির হও—অত বাড়িয়ে বোলো না—অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলো না—যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে বোসো না। আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনো সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কি কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়—তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে—সহজকবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি—তখন স্খলন হওয়াই

শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না—তখন পদে পদে যতিঃপতন হয়—যেখানে থাম্‌বার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থাম্‌বার সেখানে বেগ সামলাতে পারিনে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ওকি! ঐযে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল! ঐযে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখাবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে! ঐ যে শত্রুতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল। কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্চ এই পবিত্র নির্ম্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মত শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শ ই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই

জানতে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গণি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন—তাঁর কঠোর মূর্ত্তিই প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে—এই চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি, শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিলনা, তাদের সমুদ্র যাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না—তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্ত্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল—কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে

পড়ে—এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগ্‌ল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য্য ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোন নিশ্চয় চিহ্ন না দেখ্‌তে পেয়েও নিঃশব্দে চল্‌তে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না—তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল—তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না—তখন সকলেই আনন্দিত—সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে যায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধুজ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়—বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনে যাকে আমার সত্য বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ

বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি—তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে, সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আস্‌বে—যখন তীরের পাখী তোমার মাস্তলের উপর উড়ে বস্‌বে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না—কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাত-সহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে—সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে—সে যেন হাল আঁক্‌ড়ে বসেই থাকে।

১৭ই ফাল্গুন

বিমুখতা

সেই বিশ্বকর্ম্মা মহাত্মা যিনি জনগণের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়ে কাজ করচেন— তিনি বড় প্রচ্ছন্ন হয়েই কাজ করেন। তাঁর কাজ অগ্রসর হচ্চেই সন্দেহ নেই—কেবল সে কাজ যে চল্‌চে তা আমরা জানিনে বলেই নিরানন্দ আছে। সেই কাজে আমাদের যেটুকু যোগ দেবার আছে তা দিইনি বলেই আমাদের জীবন যেন তাৎপর্য্যহীন হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু বিশ্বকর্ম্মা তাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়ার আনন্দে প্রতিদিনই প্রতি মুহূর্ত্তেই কাজ করচেন। তিনি আমার জীবনের একটি সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিনকে চন্দ্রতারাখচিত রাত্রির সঙ্গে গাঁথচেন, আবার সেই জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জখচিত রাত্রিকে জ্যোতির্ম্ময় আর একটি দিনের সঙ্গে গেঁথে চলেছেন—আমার এই

জীবনের মণিহার রচনায় তাঁর বড় আনন্দ—আমি যদি তাঁর সঙ্গে যোগ দিতুম তবে সেই আনন্দ আমারও হত। এই আশ্চর্য্য শিল্প-রচনায় কত ছিদ্র করতে হচ্চে, কত বিদ্ধ করতে হচ্চে, কত দগ্ধ করতে হচ্চে, কত আঘাত করতে হচ্চে—সেই সমস্ত আঘাতের মধ্যেই বিশ্বকর্ম্মার সৃজনের আনন্দে আমার অধিকার জন্মাত।

কিন্তু যে অন্তরের গুহার মধ্যে আনন্দিত বিশ্বকর্ম্মা দিন রাত্রি বসে কাজ করচেন সে দিকে আমি ত তাকালুম না—আমি সমস্ত জীবন বাইরের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। দশজনের সঙ্গে মিল্‌চি মিশচি হাসি গল্প করচি আর ভাবচি কোনো মতে দিন কেটে যাচ্চে—যেন দিনটা কাটানই হচ্চে দিনটা পাবার উদ্দেশ্য। যেন দিনের কোনো অর্থ নেই।

আমরা যেন মানব জীবনের নাট্যশালায়

প্রবেশ করে যে দিকে অভিনয় হচ্চে সেদিকে মূঢ়ের মত পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি—নাট্যশালার থামগুলো, চৌকি গুলো, এবং লোকজনের ভিড়ই দেখছি—তারপরে যখন আলো নিবে গেল, যবনিকা পড়ে গেল, আর কিছুই দেখ্‌তে পাইনে, অন্ধকার নিবিড়—তখন হয়ত নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, কি করতে এসেছিলুম, কেনই বা টিকিটের দাম দিলুম, এই থাম চৌকির অর্থ কি, এতগুলো লোকই বা এখানে জড় হয়েছে কি করতে? সমস্তই ফাঁকি, সমস্তই অর্থহীন ছেলেখেলা। হায়, আনন্দের অভিনয় যে নাট্যমঞ্চে হচ্চে সে দিকের কোনো খবরই পাওয়া গেল না!

জীবনের আনন্দলীলা যিনি করচেন তিনি যে এই ভিতরে বসেই করচেন—ঐ থাম চৌকিগুলো যে বহিরঙ্গ মাত্র, ঐগুলিই প্রধান সামগ্রী নয়। একবার অন্তরের দিকে চোখ ফেরাও—তখনি সমস্ত মানে বুঝতে পারবে।

যে কাণ্ডটা হচ্চে সমস্তই যে অন্তরে হচ্চে। এই যে অন্ধকার কেটে গিয়ে এখনি ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হচ্চে একি কেবলি তোমার বাইরে? বাইরেই যদি হত তবে তুমি সেখানে কোন্‌দিক দিয়ে প্রবেশ করতে? বিশ্বকর্ম্মা যে তোমার চৈতন্যাকাশকে এই মুহূর্ত্তে একেবারে অরুণ-রাগে প্লাবিত করে দিলেন—চেয়ে দেখ তোমারি অন্তরে তরুণ সূর্য্য সোনার পদ্মের কুঁড়ির মত মাথা তুলে উঠ্‌চে, একটু একটু করে জ্যোতির পাপ্‌ড়ি চারিদিকে ছড়িয়ে দেবার উপক্রম করচে—তোমারি অন্তরে। এই ত বিশ্বকর্ম্মার আনন্দ। তোমারি এই জীবনের জমিতে তিনি এত সোনার সুতো রূপোর সুতো এত রং বেরঙের সুতো দিয়ে অহরহ এতবড় একটা আশ্চর্য্য বুনানি বুন্‌চেন —এ যে তোমার ভিতরেই—যা একেবারে বাইরে সে যে তোমার নয়।

তবে এখনি দেখ। এই প্রভাতকে

তোমারি অন্তরের প্রভাত বলে দেখ—তোমারি চৈতন্যের মধ্যে তাঁর আনন্দ-সৃষ্টি বলে দেখ—এ আর কারু নয়, এ আর কোথাও নেই—তোমার এই প্রভাতটি একমাত্র তোমারি মধ্যে রয়েছে এবং সেখানে একলামাত্র তিনিই রয়েছেন। তোমার এই সুগভীর নির্জ্জনতার মধ্যে তোমার এই অন্তহীন চিদাকাশের মধ্যে তাঁর এই অদ্ভুত বিরাট লীলা—দিনে রাত্রে অবিশ্রাম।—এই আশ্চর্য্য প্রভাতের দিকে পিঠ ফিরিয়ে এ'কে কেবলি বাইরের দিকে দেখ্‌তে গেলে এ'তে আনন্দ পাবে না অর্থ পাবে না।

যখন আমি ইংলণ্ডে ছিলুম আমি তখন বালক। লণ্ডন থেকে কিছু দূরে এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। আমি সন্ধ্যার সময় রেলগাড়িতে চড়লুম। তখন শীতকাল। সেদিন কুহেলিকায় চারিদিক আচ্ছন্ন—বরফ পড়চে। লণ্ডন ছাড়িয়ে ষ্টেশন্ গুলি বাম দিকে আস্‌তে লাগ্‌ল। যখন গাড়ি থামে আমি জানলা খুলে বাম

দিকে মুখ বাড়িয়ে সেই কুয়াশালিপ্ত অস্পষ্টতার মধ্যে কোনো একব্যক্তিকে ডেকে ষ্টেশনের নাম জেনে নিতে লাগ্‌লুম। আমার গম্য ষ্টেশনটি শেষ ষ্টেশন। সেখানে যখন গাড়ি থাম্‌ল আমি বাম দিকেই তাকালুম—সে দিকে আলো নেই প্ল্যাটফর্ম্‌ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলুম। ক্ষণকাল পরেই গাড়ি আবার লণ্ডনের অভিমুখে পিছুতে আরম্ভ করল। আমি বলি, এ কি হল! পরের ষ্টেশনে যখন গাড়ি থামল, জিজ্ঞাসা করলুম অমুক ষ্টেশন কোথায়? উত্তর শুনলুম সেখান থেকে তুমি যে এইমাত্র আস্‌চ! তাড়াতাড়ি নেবে পড়ে জিজ্ঞাসা করলুম এর পরের গাড়ি কখন্‌ পাওয়া যাবে? উত্তর পেলুম—অর্দ্ধরাত্রে। গম্য ষ্টেশনটি ডান দিকে ছিল।

আমরা জীবনযাত্রায় কেবল বাঁ দিকের ষ্টেশন গুলিরই খোঁজ নিয়ে চলেছি। ডানদিকে কিছুই নেই বলে একেবারে নিশ্চিন্ত।

একটার পর একটা পার হয়েই গেলুম। স্থানে নামবার ছিল সেখানেও সংসারের দিকেই ঐ বামদিকেই চেয়ে দেখ্‌লুম—দেখ্‌লুম সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত কুয়াশায় অস্পষ্ট। যে সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল সে সুযোগ কেটে গেল— গাড়ি ফিরে চলেছে। যেখানে নিমন্ত্রণ ছিল সেখানে আমোদ আহ্লাদ অতীত হতে চলল। আবার গাড়ি কখন্ পাওয়া যাবে! এই যে সুযোগ পেয়েছিলুম ঠিক এমন সুযোগ কখন্ পাব—কোন্ অর্দ্ধরাত্রে!

মানবজীবনের ভিতর দিয়েই যে চরম স্থানে যাওয়া যেতে পারে এমন একটা ষ্টেশন আছে। সেখানে যদি না নামি—সেখানকার প্ল্যাটফর্ম্ম যেদিকে সেদিকে যদি না তাকাই তবে সমস্ত যাত্রাই যে আমার কাছে একটা নিতান্ত কুহেলিকাবৃত নিরর্থক ব্যাপার বলে ঠেকবে তাতে সন্দেহ কি আছে! কেন যে টিকিটের দাম দিলুম, কেন যে গাড়িতে উঠ্‌লুম—

অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়ে কেন যে চল্লুম কি যে হল কিছুই বোঝা গেল না। নিমন্ত্রণ আমার কোথায় ছিল—ভোজের আয়োজনটা কোথায় হয়েছে—ক্ষুধা আমার কোন্‌খানে মিট্‌বে, আশ্রয় আমি কোন্‌খানে পাব সে প্রশ্নের কোনো উত্তর না পেয়েই হতবুদ্ধি হয়ে যাত্রা শেষ করতে হল!

হে সত্য, আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও—আমি যে কেবল অসত্যের দিকেই তাকিয়ে আছি! তোমার আনন্দলীলা মঞ্চে তুমি সারি সারি আলো জ্বালিয়ে দিয়েছ—আমি তার উল্টোদিকের অন্ধকারে তাকিয়ে ভেবে মরচি এ সমস্ত কি—তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবলি দেখ্‌চি মৃত্যু—তার কোনো মানেই ভেবে পাচ্চিনে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্চি। ঠিক তার ওপাশেই যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে

কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে ? হে আবিঃ—তুমি যে প্রকাশরূপে নিরন্তর রয়েছ—সেই প্রকাশের দিকেই আমার দৃষ্টি নেই—আমি হতভাগ্য। সেই জন্যে আমি কেবল তোমাকে রুদ্রই দেখ্‌চি—তোমার প্রসন্নতা যে আমার আত্মাকে নিয়ত পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা জান্‌তেই পারচিনে। মার দিকে পিঠ করে শিশু অন্ধকার দেখে কেঁদে মরে—একবার পাশ ফিরলেই জান্‌তে পারে মা যে তাকে আলিঙ্গন করেই রয়েছেন। তোমার প্রসন্নতার দিকেই তুমি আমাদের পাশ ফিরিয়ে নাও হে জননি—তা হলেই একমুহূর্ত্তে জান্‌তে পারব আমি রক্ষা পেয়েই আছি—অনন্তকাল আমার রক্ষা—নইলে অরক্ষাভয়ের কান্না কোনোমতেই থাম্‌বে না।

১৮ই ফাল্গুন

মরণ

ঈশ্বরের সঙ্গে খুব একটা সৌখীন রকমের যোগ রক্ষা করার মৎলব মানুষের দেখ্‌তে পাই। যেখানে যা যেমন আছে তা ঠিক সেই রকম রেখে সেইসঙ্গে অমনি ঈশ্বরকেও রাখবার চেষ্টা। তাতে কিছুই নাড়ানাড়ি করতে হয় না। ঈশ্বরকে বলি, তুমি ঘরের মধ্যে এসো কিন্তু সমস্ত বাঁচিয়ে এসো—দেখো আমার কাঁচের ফুলদানিটা যেন না পড়ে যায়—ঘরের নানাস্থানে যে নানা পুতুল সাজিয়ে রেখেছি তার কোনোটা যেন ঘা লেগে ভেঙে না যায়! এ আসনটায় বোসনা এটাতে আমার অমুক বসে—এ জায়গায় নয় এখানে আমি অমুক কাজ করে থাকি, এ ঘর নয় এ আমার অমুকের জন্যে সাজিয়ে রাখচি। এই করতে করতে

সবচেয়ে কম জায়গা এবং সবচেয়ে অনাবশ্যক স্থানটাই আমরা তাঁর জন্যে ছেড়ে দিই।

মনে আছে আমার পিতার কোনো ভৃত্যের কাছে ছেলেবেলায় আমরা গল্প শুনেছি যে, সে যখন পুরীতীর্থে গিয়েছিল তার মহা ভাবনা পড়েছিল জগন্নাথকে কি দেবে! তাঁকে যা দেবে সে ত কখনো সে আর ভোগ করতে পারবেনা। সেইজন্যে সে যে জিনিষের কথাই মনে করে কোনোটাই তার দিতে মন সরে না—যাতে তার অল্পমাত্রও লোভ আছে সেটাও, চিরদিনের মত দেবার কথায়, মন আকুল করে তুল্তে লাগ্ল। শেষকালে বিস্তর ভেবে সে জগন্নাথকে বিলিতি বেগুন দিয়ে এল। এই ফলটিতেই সে লোকের সব চেয়ে কম লোভ ছিল।

আমরাও ঈশ্বরের জন্যে কেবলমাত্র সেই টুকুই ছাড়তে চাই যেটুকুতে আমাদের সবচেয়ে কম লোভ—যেটুকু আমাদের নিতান্ত উদ্বৃত্তের

উদ্বৃত্ত। ঈশ্বরের নামগাঁথা ছুটো একটা মন্ত্র পাঠ করা গেল—ছুটি একটি সঙ্গীত শোনা গেল, যাঁরা বেশ ভাল বক্তৃতা করতে পারেন তাঁদের কাছ থেকে নিয়মিত বক্তৃতা শোনা গেল—বল্লুম বেশ হল, বেশ লাগ্‌ল, মনটা এখন বেশ পবিত্র ঠেক্‌ছে—আমি ঈশ্বরের উপাসনা করলুম।

এ'কেই আমরা বলি উপাসনা। যখন বিত্তার, ধনের বা মানুষের উপাসনা করি তখন সেটা এত সহজ উপাসনা হয় না—তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝ্‌তে বাকি থাকেনা কেবল ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্চে উপাসনার মধ্যে সব চেয়ে ফাঁকি।

এর মানে আর কিছুই নয় নিজের অংশ-টাকেই সব চেয়ে বড় করে ঘের দিয়ে নিয়ে ঈশ্বরকে একপাই অংশের সরিক করি এবং মনে করি আমার সকল দিক রক্ষা হল।

আমাদের দেশে একটা কথা প্রচলিত আছে "যা দ্বয়লোকসাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী"—যাতে দুইলোকেরই সাধনা হয় মানুষের সেই চাতুরীই চাতুরী।

কিন্তু যে চাতুরী দুইলোক রক্ষার ভার নেয় শেষকালে সে ঐ দুই লোকের মধ্যে একটা লোকের কথা ভুল্‌তে থাকে, তার চাতুরী ঘুচে যায়। যে লোকটি আমার দিকের লোক অধিকাংশ স্থলে সেই দিকের সীমানাই অজ্ঞাতসারে এবং জ্ঞাতসারে বেড়ে চল্‌তে থাকে;—ঈশ্বরের জন্যে ঐ যে এক পাই জমি রেখেছিলুম যদি তাতে কোনো পদার্থ থাকে, যদি সেটা নিতান্তই বালিচাপা মরুভূমি না হয়, তবে একটু একটু করে লাঙল ঠেলে ঠেলে সেটা আত্মসাৎ করে নেবার চেষ্টা করি। "আমি" জিনিষটা যে একটা মস্ত পাথর—তার ভার যে ভয়ানক ভার—যেদিক-টাতে সেই আমিটাকে চাপাই সেইদিকটাতেই

যে ধীরে ধীরে সমস্তটাই কাৎ হয়ে পড়তে চায়। যদি রক্ষা পেতে চাও তবে ঐটেকেই একেবারে জলের মধ্যে ফেলে দিতে পারলেই ভাল হয়।

আসল কথা, সবটাই যদি ঈশ্বরকে দিতে পারি তাহলেই দুই লোক রক্ষা হয়—চাতুরী করতে গেলে হয় না। তাঁর মধ্যেই দুই লোক আছে। তাঁর মধ্যেই যদি আমাকে পাই তবে একসঙ্গেই তাঁকেও পাই আমাকেও পাই—আর তাঁর সঙ্গে যদি ভাগ বিভাগ করে সীমানা টেনে পাকা দলিল করে নিয়ে কাজ চালাতে চাই তাহলে সেটা একেবারেই পাকা কাজ হয় না—সেটা বিষয়কর্ম্মের নামান্তর হয়। বিষয়কর্ম্মের যে গতি তারও সেই গতি—অর্থাৎ তার মধ্যে নিত্যতার লক্ষণ নেই—তার মধ্যে বিকার আসে এবং ক্রমে মৃত্যু দেখা দেয়।

ও সমস্ত চাতুরী ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ ই আত্মসমর্পণ করতে হবে এই

কথাটাকেই পাকা করা যাক্। আমার দুইয়ে কাজ নেই আমার একই ভাল। আমার অন্তরাত্মার মধ্যে একটি সতীর লক্ষণ আছে, সে চতুরা নয়,—সে যথার্থ ই দুইকে চায় না, সে একেকেই চায়, যখন সে এককে পায় তখনি সে সমস্তকেই পায়।

একাগ্র হয়ে সেই একের সাধনাই করব কিন্তু কঠিন সঙ্কট এই যে, আজ পর্য্যন্ত সে জন্যে কোনো আয়োজন করা হয় নি। সেই পরমকে বাদ দিয়েই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়ে গেছে। জীবন এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেছে যে, কোনোমতে ঠেলে ঠুলে তাঁকে জায়গা করে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে এসেছে।

পৃথিবীতে আর সমস্তই গোঁজামিলন দেওয়া যায়—যেখানে পাঁচজনের বন্দোবস্ত সেখানে ছ জনকে ঢুকিয়ে দেওয়া খুব বেশি শক্ত নয় কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সে রকম গোঁজামিলন চালাতে গেলে একেবারেই চলে না। তিনি

"পুনশ্চ নিবেদনের" সামগ্রী নন। তাঁর কথা যদি গোড়া থেকে ভুলেই থাকি তবে গোড়াগুড়ি সে ভুলটা সংশোধন না করে নিলে উপায় নেই। যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে এখন অমনি এক রকম করে কাজ সেরে নেও এ কথা তাঁর সম্বন্ধে কোনোমতেই খাটবে না।

ঈশ্বর বিবর্জ্জিত যে জীবনটা গড়ে তুলেছি তার আকর্ষণ যে কত প্রবল তা তখনি বুঝতে পারি যখন তাঁর দিকে যেতে চাই। যখন তার মধ্যেই বসে আছি তখন সে যে আমাকে বেঁধেছে তা বুঝতেই পারিনে। কিন্তু প্রত্যেক অভ্যাস, প্রত্যেক সংস্কারটিই কি কঠিন গ্রন্থি! জ্ঞানে তাকে যতই তুচ্ছ বলে জানিনে কেন, কাজে তাকে ছাড়াতে পারি নে—একটা ছেড়ে ত দেখ্‌তে পাই তার পিছনে আরো পাঁচটা আছে।

সংসারকে চরম আশ্রয় বলে জেনে এত-

দিন বহুযত্নে দিনে দিনে একটি একটি করে অনেক জিনিষ সংগ্রহ করেছি—তাদের প্রত্যেকটির ফাঁকে ফাঁকে আমার কত শিকড় জড়িয়ে গেছে তার ঠিকানা নেই—তারা সবাই আমার! তাদের কোনোটাকেই একটু-মাত্র স্থানচ্যুত করতে গেলেই মনে হয় তবে আমি বাঁচব কি করে! তারা যে বাঁচ্‌বার জিনিষ নয় তা বেশ জানি তবু চিরজীবনের সংস্কার তাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বলতে থাকে এদের না হলে আমার চল্‌বে না যে! ধনকে আপনার বলে জানা যে নিতান্তই অভ্যাস হয়ে গেছে। সেই ধনের ঠিক্‌ ওজনটি যে আজ বুঝ্‌ব সে শক্তি কোথায় পাই—বহুদীর্ঘকাল ধরে আমির ভারে সেই ধন যে পর্ব্বত সমান ভারি হয়ে উঠেছে—তাকে একটুও নড়াতে গেলে যে বুকের পাঁজরে বেদনা ধরে!

এই জন্তেই ভগবান যিশু বলেছেন, যে ব্যক্তি ধনী তার পক্ষে মুক্তি অত্যন্ত কঠিন।

ধন এখানে শুধু টাকা নয়। জীবন যা কিছু-কেই দিনে দিনে আপনার বলে সঞ্চয় করে তোলে, যাকেই সে নিজের বলে মনে করে এবং নিজের দিকেই আঁকড়ে রাখে, সে ধনই হোক্ আর খ্যাতিই হোক্—এমন কি, পুণ্যই হোক্।

এমন কি, ঐ পুণ্যের সঞ্চয়টা কম ঠকায় না। ওর একটি ভাব আছে যেন ও যা নিচ্চে তা সব ঈশ্বরকেই দিচ্চে। লোকের হিত করচি, ত্যাগ করচি, কষ্ট স্বীকার করচি—অতএব আর ভাবনা নেই—আমার সমস্ত উৎসাহ ঈশ্বরের উৎসাহ—সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরের কর্ম্ম! কিন্তু এর মধ্যে যে অনেকখানি নিজের দিকেই জমাচ্চি সে খেয়ালমাত্র নেই।

যেমন মনে কর আমাদের এই বিদ্যালয়। যেহেতু এটা মঙ্গল কাজ সেই হেতু এর যেন আর হিসাব দেখবার দরকার নেই—যেন এর সমস্তই ঈশ্বরের খাতাতেই জমা হচ্চে। আমরা

যে প্রতিদিন তহবিল ভাঙচি তার খোঁজও রাখিনে। এ বিদ্যালয় আমাদের বিদ্যালয়, এর সফলতা আমাদেরই সফলতা—এর দ্বারা আমরাই হিত করচি—এমনি করে এ বিদ্যালয় থেকে আমার দিকে কিছু কিছু করে জমা হচ্চে—সেই সংগ্রহ আমার অবলম্বন হয়ে উঠ্‌চে—সেটা একটা বিষয় সম্পত্তির মত হয়ে দাঁড়াচ্চে—এই কারণে তার জন্যে রাগারাগি টানাটানি হতে পারে—তার জন্যে মিথ্যে সাক্ষী সাজাতেও ইচ্ছা করে—পাছে কেউ কোনো ত্রুটি ধরে ফেলে এই ভয় হয়—লোকের কাছে এর অনিন্দনীয়তা প্রমাণ করে তোল্‌বার জন্যে একটু বিশেষভাবে ঢাকাঢুকি দেবার আগ্রহ জন্মে। কেননা এসব যে আমার অভ্যাস, আমার নেশা, আমার খাদ্য হয়ে উঠ্‌চে—এর থেকে যদি ঈশ্বর আমাকে একটু বঞ্চিত করতে চান আমার সমস্ত প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

প্রতিদিনের অভ্যাসে বিদ্যালয় থেকে এই যে

অংশটুকু নিজের ভাগেই সঞ্চয় করে তুলচি সেইটে সরিয়ে দাও দেখি, মনে হবে এর কোথাও যেন আর আশ্রয় পাচ্চিনে। তখন ঈশ্বরকে আর আশ্রয় বলে মনে হবে না।

এই জন্যে সঞ্চয়ীর পক্ষেই বড় শক্ত সমস্যা। সে ঐ সঞ্চয়কেই চরম আশ্রয় বলে একেবারে অভ্যাস করে বসে আছে—ঈশ্বরকে তাই সে চারিদিকে সত্য করে অনুভব করতে পারে না—শেষ পর্য্যন্তই সে নিজের সঞ্চয়কে আঁকড়ে বসে থাকে।

অনেকদিন থেকে অনেক সঞ্চয় করে যে বসেছি—সে সমস্তর কিছু বাদ দিতে মন সরে না। সেই জন্যে মনের মধ্যে যে চতুর হিসাবী কানে কলম গুঁজে বসে আছে সে কেবলি পরামর্শ দিচ্চে—কিছু বাদ দেবার দরকার নেই,—এরি মধ্যে কোনো রকম করে ঈশ্বরকে একটুখানি জায়গা করে দিলেই হবে।

না, তা হবে না—তার চেয়ে অসাধ্য আর

কিছুই হতে পারে না। তবে কি করা কর্ত্তব্য?

একবার সম্পূর্ণ মরতে হবে—তবেই নূতন করে ভগবানে জন্মানো যাবে। একেবারে গোড়াগুড়ি মরতে হবে।

এটা বেশ করে জান্‌তে হবে—যে জীবন আমার ছিল—সেটা সম্বন্ধে আমি মরে গেছি। আমি সে লোক নই—আমার যা ছিল তার কিছুই নেই। আমি ধনে মরেছি, খ্যাতিতে মরেছি, আরামে মরেছি, আমি কেবলমাত্রই ভগবানে বেঁচেছি। নিতান্ত সদ্যোজাত শিশুটির মত নিরুপায়, অসহায়, অনাবৃত হয়ে তাঁর কোলে জন্মগ্রহণ করেছি—তিনি ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। তার পরে তাঁর সন্তান-জন্ম সম্পূর্ণভাবে সুরু করে দাও—কিছুর পরে কোনো মমতা রেখো না।

পুনর্জন্মের পূর্ব্বে এখন সেই মৃত্যুবেদনা। যাকে নিশ্চিত চরম বলে অত্যন্ত সত্য বলে

জেনেছিলুম একটি একটি করে একটু একটু করে তার থেকে মরতে হবে। এস মৃত্যু এস —এস অমৃতের দূত এস—

এস অপ্রিয় বিরস তিক্ত,
এস গো অশ্রুসলিল সিক্ত,
এস গো ভূষণবিহীন রিক্ত,
এস গো চিত্ত পাবন।
এস গো পরম দুঃখ নিলয়,
আশা অঙ্কুর করহ বিলয়;
এস সংগ্রাম, এস মহাজয়,
এস গো মরণ সাধন॥

১৯শে ফাল্গুন

ফল

ভিতরের সাধনা যখন আরম্ভ হয়ে গেছে —তখন বাইরে তার কতকগুলি লক্ষণ আপনি প্রকাশ হয়ে পড়তে থাকে ;—সে লক্ষণগুলি কি রকম তা একটি উপমার সাহায্যে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করি।

গাছের ফলকে মানুষ বরাবর নিজের সার্থকতার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। বস্তুত মানুষের লক্ষ্যসিদ্ধি, মানুষের চেষ্টার পরিণামের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন জিনিষ যদি জগতে কোথাও থাকে তবে সে গাছের ফলে। নিজের কর্ম্মের রূপটিকে নিজের জীবনের পরিণামকে যেন ফলের মধ্যে আমরা চক্ষে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই।

ফল জিনিষটা সমগ্র গাছের শেষ লক্ষ্য— পরিণত মানুষটি তেমনি সমস্ত সংসার বৃক্ষের শেষলাভ।

কিন্তু মানুষের পরিণতি যে আরম্ভ হয়েছে তার লক্ষণ কি? একটি আম ফল যে পাকৃচে তারই বা লক্ষণ কি?

সব প্রথমে দেখা যায়, তার বাইরে একটা প্রান্তে একটু রং ধরতে আরম্ভ করেছে। তার শ্যামবর্ণ ঘুচবে ঘুচবে করচে—সোনা হয়ে ওঠবার চেষ্টা।

আমাদেরও ভিতরে যখন পরিণতি আরম্ভ হয় বাইরে তার দীপ্তি দেখা দেয়। কিন্তু সব জায়গায় সমান নয়—কোথাও কালো কোথাও সোনা। তার সকল কাজ সকল ভাব সমান উজ্জ্বলতা পায় না—কিন্তু এখানে-ওখানে যেন জ্যোতি দেখা দিতে থাকে।

নিজের পাতারই সঙ্গে ফলের যে বর্ণ-সাদৃশ্য ছিল সেটা ক্রমশ ঘুচে আস্‌তে থাকে—চারিদিকে আকাশের আলোর যে রং সেই রঙের সঙ্গেই তার মিল হয়ে আসে। যে গাছে তার জন্ম সেই গাছের সঙ্গে নিজের

রঙের পার্থক্য সে আর কিছুতেই সম্বরণ করতে পারে না—চারিদিকের নিবিড় শ্যামলতার আচ্ছাদন থেকে সে বাহিরের আকাশে প্রকাশ পেয়ে উঠ্‌তে থাকে।

তার পরে তার বাহিরটি ক্রমশই কোমল হয়ে আসে। আগে বড় শক্ত আঁট ছিল—কিন্তু এখন আর সে কঠোরতা নেই। দীপ্তিময় সুগন্ধময় কোমলতা।

পূর্ব্বে তার যে রস ছিল সে রসে তীব্র অম্লতা ছিল এখন সমস্ত মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এখন তার বাইরের পদার্থ সমস্ত বাইরেরই হয়—সকলেরই ভোগের হয়—সকলকে আহ্বান করে কাউকে ঠেকাতে চায় না। সকলের কাছে সে কোমল সুন্দর হয়ে ওঠে। গভীরতর সার্থকতার অভাবেই মানুষের তীব্রতা কঠিনতা এমন উগ্রভাবে প্রকাশ পায়—সেই আনন্দের দৈন্যেই তার দৈন্য, সেই জন্যেই সে বাহিরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়।

তার পরে তার ভিতরকার যেটি আসল জিনিষ, তার আঁটি—যেটিকে বাইরে দেখাই যায় না, তার সঙ্গে তার বাহিরের অংশের একটা বিশ্লিষ্টতা ঘটতে থাকে—সেটা যে তার নিত্য-পদার্থ নয় তা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসে। তার শস্য অংশের সঙ্গে তার ছালটা পৃথক্ হতে থাকে—ছাল অনায়াসে শাঁস থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া যায়—আবার তার শাঁসও আঁটি থেকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে ফেলা সহজ হয়। তার বোঁটা এতদিন গাছকে আঁকড়ে ছিল তাও আলগা হয়ে আসে। গাছের সঙ্গে নিজেকে সে আর অত্যন্ত এক করে রাখে না—নিজের বাহিরের আচ্ছাদনের সঙ্গেও নিজের ভিতরের আঁটিকে সে নিতান্ত একাকার করে থাকে না।

সাধক তেমনি যখন নিজের ভিতরে নিজের অমরত্বকে লাভ করতে থাকেন—সেখানটি যখন সুদৃঢ় সুসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন তাঁর বাইরের পদার্থটি ক্রমশই শিথিল হয়ে আস্‌তে

থাকে—তখন তাঁর লাভটা হয় ভিতরে, আর দানটা হয় বাইরে।

তখন তাঁর ভয় নেই—কেন না তখন তাঁর বাইরের ক্ষতিতে তাঁর ভিতরের ক্ষতি হয় না। তখন শাঁসকে আঁটি আঁকড়ে থাকে না; শাঁস কাটা পড়লে অনাবৃত আঁটির মৃত্যুদশা ঘটে না। তখন পাখীতে যদি ঠোকরায় ক্ষতি নেই, ঝড়ে যদি আঘাত করে বিপদ নেই, গাছ যদি শুকিয়ে যায় তাতেও মৃত্যু নেই। কারণ, ফল তখন আপন অমরত্বকে আপন অন্তরের মধ্যে নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করে—তখন সে "অতিমৃত্যুমেতি"। তখন সে আপনাকে আপনার নিত্যতার মধ্যেই সত্য বলে জানে—অনিত্যতার মধ্যেই নিজেকে সে নিজে বলে জানে না—নিজেকে সে শাঁস বলে জানে না, খোসা বলে জানে না, বোঁটা বলে জানে না—সুতরাং ঐ শাঁস খোসা বোঁটার জন্যে তার আর কোনো ভয় ভাবনাই নেই।